মমিনের দেশে ফেরা

কাজী জহিরুল ইসলাম

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। সূর্য্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। নারকেল বিথীর ছায়ারা বড় হতে হতে সৈকতের নরোম বালু পেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ছে আটলান্টিকের নীল জলে। আমরা বিচ থেকে উঠে এলাম সদর রাস্তায়। এসফল্টের সুবিশাল রাস্তা আমাদের নিয়ে যাবে আবিদজান শহরে। কিছুদূর এগুতেই পথের দুপাশে অসংখ্য দোকান। দোকান নয়, যেন ওগুলো গ্যালারী। ভেতরে, বাইরে শত শত পেইন্টিংস সাজানো। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে শুরু করলাম ছবিগুলো। আফ্রিকান নারীদের গুরু নিতম্ব আর বিশাল স্তনকে উপজীব্য করেই আঁকা হয়েছে অধিকাংশ ছবি। উপাসনালয়ের গম্বুজ, ঢোল-তবলা সবকিছুতেই কালো নারীর স্তনের আদল। বেশীর ভাগই তেলরঙয়ের কাজ, কিছু জলরঙও দেখতে পেলাম। ওরা শুধু ক্যানভাসের ওপরই কাজ করেনি। মিডিয়াম হিসাবে ব্যাবহার করেছে বোর্ড, পাটের চট, পাখির পালক, ছন, দড়ি আরো কতো কি। একটি ছবিতে দেখলাম এক নারী ঝাড়ু হাতে তাড়া করছে কাউকে, অন্য আর দশটা ছবির মতোই ওরও বুক খোলা, ঝাড়ুটিতে শিল্পী ব্যবহার করেছে থ্রি ডাইমেনশন। আর এজন্য একটি আস্ত ঝাড়ু ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটির হাতে। এত্তো এত্তো ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাস্তার পাশে। নিশ্চয়ই খুব সস্তা হবে। দাম জিজ্ঞেস করেতো অবাক হয়ে গেলাম। বলে কি? এক একটা ছবির দাম, দেড়'শ, দু'শ ডলার! তার মানে এগুলো আজে-বাজে শিল্পীর আঁকা নয়? এক দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম। ভাই, এতো দাম কেনো? ও খুব অবাক হলো। আমাকে বললো, এগুলো পেইন্টিংস, ক্যামেরায় তোলা ছবি নয়। ও হয়ত আমাকে চিত্রকলা বিষয়ে গো-মূর্খ ভেবে থাকবে।

আমরা যখন আবিদজান শহরে ঢুকলাম তখন শহরের গায়ে অন্ধকারের কালো জামা, সেই জামার বোতাম হয়ে জ্বলছে হাজারো শহরবাতি। হঠাৎ কর্ণেল আতিক বললেন, আমার একজন রুগী আছে হাসপাতালে, চলেন যাই একটু দেখে আসি। হাসপাতাল কথাটা শুনেই স্টিয়ারিঙয়ে আমার হাত কেঁপে উঠলো। আবার কে এলো? তিনি জানালেন, ওর নাম মমিন, আব্দুল মমিন। ব্যানব্যাট-১ এর সৈনিক। ছেলেটির অবস্থা খুব ভালো নয়। সম্ভবত লিউকোমিয়া। এখনো নিশ্চিত নই আমরা, আরো কিছু টেস্ট করার বাকী আছে। এবার আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

হাসপাতালে গিয়ে মমিনকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। ৩০১ নম্বরে ওর থাকার কথা কিন্তু রুম ফাকা, কেউ নেই ওখানে। এর মানে কি? কর্ণেল আতিক তাকালেন আমার চোখের দিকে। এই দৃষ্টিটা আমি চিনি। একটা অজানা আশঙ্কা। আশপাশে কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না যে জিজ্ঞেস করবো। হাসপাতালের সুবিশাল টানা বারান্দা। এমাথা-ওমাথা দেখা যায় না। হলুদাভ আলোর নিচে ডুবে আছে এক ভীতিকর নীরবতা। অনেকক্ষণ পর সবুজ এপ্রণ পরা এক কালো মেয়ে আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওকে ধরলাম। মেয়েটি ইংরেজী বোঝে না। আমাদের ফ্রেঞ্চও তথৈবচ। তবে ও আমাদের প্রশ্ন বুঝলো। আমাদের অঙ্গ সঞ্চালন, আর বাংলাদেশ এবং মমিন শব্দগুলোই ও পিক করলো। বললো, ৩২৭ নম্বর রুমে। আমরা ছুটলাম ৩২৭ নম্বর রুমের দিকে, করিডোরের অন্য প্রান্তে।

মমিনের হাতে স্যালাইন লাগানো। আমাদের দেখে ও বিছানা থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো, ফোজি কায়দায় সেলুট দেওয়ার ভঙ্গিতে কর্ণেল আতিককে সালাম দিলো। সালাম দিয়েই ও ব্যস্ত হয়ে পড়লো

আমাদের বসার জন্য চেয়ার টানাটানিতে। আমরা যতোই বলি, তুমি বসো, আমাদের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ও কিছুতেই আমাদের কথা শুনবে না। একজন বাংলাদেশী মেডিকেল এসিসট্যান্ট আছে ওর সাথে, সার্বক্ষনিক এটেনডেন্ট হিসাবে। মমিন তাকে অনুরোধ করছে আমাদেরকে আপেল-কমলা দেবার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অসুখের কথা বাড়িতে জানিয়েছ? একটা নিস্পাপ হাসিতে উদ্ভাসিত ওর মুখ, 'না স্যার'। এরপর কিছুটা লাজুকতা। 'বাচ্চার মা খুব কষ্ট পাবে। আমার অসুখ-বিসুখের কথা শুনলে খুব কান্না-কাটি করে। সামান্য জ্বর-জারি, দুই/চার দিনের ব্যাপার। আর মিশনও শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র দুই মাস। এরপরইতো ইনশাল্লাহ দেশে ফিরে যাবো।'। কর্ণেল আতিক জিজ্ঞেস করেন, তোমার অসুখটা কি জানো? 'না স্যার, ঘুষঘুষে জ্বর ছিল কিছুদিন। কিছু খেলেই বমি করে দিতাম। এখন অনেকটা ভালো। এখন খেতে পারি। বমিটা বন্ধ হয়ে গেছে। রক্তে কি-না কি একটা সমস্যা ছিল। ডাক্তার বলেছে সেটাও ভালো হয়ে আসতেছে। দোয়া করবেন স্যার'।

আমরা মমিনকে রেখে বেরিয়ে এলাম। মেডিকেল এসিসট্যান্ট জানালো, 'কেমোথেরাপি চলছে স্যার'।

সাত/আটদিন পর একটি অফিশিয়াল ব্রডকাস্ট এলো আমার মেইলবক্সে। *'বাংলাদেশী সৈনিক আব্দুল মমিন আজ সকালে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৭ বছর। প্রাইভেট মমিন ব্লাড ক্যানসারে ভুগছিলেন।'* আমার চোখ ভিজে উঠলো। আমার গালে অশ্রুধারা। মমিন বলেছিল, আর মাত্র দুই মাস, এরপরই দেশে ফিরে যাবে। এর আগেই ও দেশে ফিরে যাচ্ছে, ওর প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে, প্রিয় স্বদেশের কাছে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৮ মার্চ, ২০০৭